গন্ধ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

গন্ধ

কলকাতায় আবার বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়েছে। রাস্তাঘাট এবং সব সবুজ মাঠ যদি কোথাও থাকে প্রায় খালবিলের মতো। উত্তর থেকে হাওয়া এলে জানালা দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ থেকে হাওয়া এলে দরজা জানালা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের সময় দক্ষিণের হাওয়া প্রবল। গাড়ি ঘোড়া বাস ট্রাম ভিজতে ভিজতে চলে যায়। কখনো সার সার থেমে থাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। আকাশ চুরমার করে দিয়ে বজ্রপাতের শব্দ নেমে আসে। তখন কেউ হুইসকি গলায় ঢেলে বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনতে ভালোবাসে। ক্যাবারেগুলোতে মধ্য যামিনীতে উদ্দাম। নৃত্যমালা। কলকাতায় যে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়ে গেল, একেবারেই তখন তা বোঝা যায় না।

দেবদারু গাছটা ল্যাম্পপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে ভিজছে। সকাল থেকে বৃষ্টি। সারারাত বৃষ্টি গেছে। রাস্তায় জল জমছে। বাড়ছে। লোকজন হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে, মেয়েরা শাড়ি তুলে, ছেলেরা প্যান্ট ভিজিয়ে জল ভেঙে যাচ্ছে। কলকাতার এ-সময়ের চেহারা কেমন পাল্টে যায়। নরকের মতো হয়ে যায়। এবং দেবদারু গাছটার নীচে যে সংসারটা ছিল সেটা থাকে না। কোথাও উধাও হয়ে যায়। এবং জল নামতে শুরু করলে, হাইড্রেন খুলে ফেললে দেখা যায় শহরের ওপর সব কাক উড়ছে। এ-সময়টাতে শহরে বোধ হয় কাকের উপদ্রব বাড়ে।

সকালে বিকেলে এভাবে বৃষ্টিপাতের ভেতর যখন কলকাতা ভিজছিল, যখন রাস্তায় মানুষের ভিড় উপছে পড়ছে এবং যখন সূর্য আর দেখা যাবে না বলে সবাই কোলাহল করছে তখন ফ্ল্যাট বাড়ির জানালায় একটা দুঃখী মুখ দেখা গেল। সে দাঁড়িয়ে আছে। দেবদারু গাছটার নীচে জল উঠে এসেছে। ছেড়া নেকড়া, হাঁড়িপাতিল ভাঙা এবং দূরে সে টের পেল গাড়িবারান্দার নীচে সেই সংসারের বুড়ো মানুষটি হাঁটু মুড়ে পরিত্যক্ত রোয়াকে বসে শীতে কাঁপছে।

দুঃখী মেয়েটা বেশ সুখে ছিল। বাবা এই সুন্দর ফ্ল্যাট কিনে চলে এসেছে। না এখন আরও যুবতী হয়ে উঠেছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে রোজ সেই দেবদারু গাছ। একেবারে পরিপাটি সংসারের বাইরে বিশ্রী সাংঘাতিক কিছু। সে যে প্রথম দেখছে এমন, সে যে আর কখনো ভিখিরি অথবা ফুটপাথবাসিনীদের দেখেনি তা নয়। কিন্তু এখানে সে রোজ সকালে উঠে যখন স্কুলে যায় দেখতে পায় বছর দু-বছরের বাচ্চাটা পড়ে থাকে গাছের নীচে। ঘুমোচ্ছে। কিংবা কখনো বসে বসে খেলা করছে। ওর বড়ো বোনটা বসে বসে উকুন মারছে। এবং যখন স্কুল থেকে সে বেণি দুলিয়ে ফেরে, দেখতে পায়, কোত্থেকে সেই মেয়ে এবং মা সংগ্রহ করে এনেছে রাজ্যের পচা পটল, পেয়াজ, কুমড়ো, মাছের পচা নাড়িভুঁড়ি, পাঁঠার মাথার কঙ্কাল। ভীষণ দুর্গন্ধে ওর পেট গুলিয়ে ওঠে। সিঁড়ি ভাঙার সময় সব সুখ কারা এভাবে কেড়ে নেয় তার। সে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে বাথরুমে ঢুকে যায়। জল বমি করে ফেলে।

মা দৌড়ে আসে। রানু আবার বমি করছিস।—পেটটা আবার গুলিয়ে উঠল। এভাবেই মেয়েটার অসুখটা আরম্ভ হয়ে যায়। ডাক্তার হাসপাতাল, হাসপাতালে গেলে কমে যায়, এবং বাড়ি ফিরে এলেই আবার কেমন তার অসুখ।-মা তুমি পাচ্ছ না।

কী পাব!

কেমন একটি গন্ধ!

না তো।

সত্যনারায়ণ বাড়ি ফিরে শুনতে পায়, মেয়েটা আবার খাচ্ছে না। খাবার দেখলেই বমি করে ফেলে।

কী গন্ধরে বাবা! জানালাটা মা বন্ধ করে দাও।

সত্যনারায়ণ মোটামুটি হিসেবি মানুষ, সামান্য ক্লার্ক থেকে বড়োবাবু, অফিসের। এবং টাকা লেনদেনের ব্যাপারে চতুর। স্ত্রীর অভাব-অনটন সে একেবারেই রাখেনি, যা যা চাই ফ্ল্যাট বাড়ি এবং ফ্রিজ নতুন গডরেজের আলমারি, এবং হিসেবি বলে এক মাত্র মেয়ে রানু। সংসারের কোথাও সে হিসেবের বাইরে নয়। পুত্রসন্তানের যে ইচ্ছে ছিল না, এমন নয়, কিন্তু যা হয়ে থাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে সে আর যায়নি। সে একটি হবার পরই সব

থামিয়ে রেখেছে এবং গতকাল এই শহরে বৃষ্টিপাতের ঠিক আগে সে দেখে এসেছিল, দেবদারু গাছটার নীচে, বৌটা আবার একটা বাচ্ছা দিয়েছে। এই নিয়ে কটা বাচ্ছা। সে ঠিক গুনে বুঝতে পারে না। ওদের কটা বাচ্চা, সে টের পায় না। বৌটার সঠিক স্বামী কোনটা। সে দেখতে পায়, তিন-চারজন পুরুষ, পরনে লুঙ্গি, কানে বিড়ি গোঁজা, গলায় তাবিজ, এবং সূর্যাস্তের মুখে তারা কোথায় চলে যায়। আবার সে কখনো দেখে বেশ আরামে বৌটার কোলে মোথা রেখে ঘুমোচ্ছে একটা বুড়ো মতো মানুষ। শহরে বাস ট্রাম তেমনি যায়। রাস্তায় লোকাভাব থাকে না, কলেজ এবং স্কুল ছুটি হলে সব সুন্দর সুন্দর দিদিমণিরা কত সব ফিসফাস কথা বলতে বলতে চলে যায়। সত্যনারায়ণ ভেবে পায় না এখন বৌটার ক-টা বাচ্ছা। একটা দুটো না দু-সহস্র।

এবং যা হয়, সে রাস্তায় কোনো অপোগণ্ড দেখলেই ভেবে ফেলে সেই বৌটার পেট থেকে বাচ্চাটা বের হয়েছে।

সত্যনারায়ণ দরজা জানালা সব বন্ধ করে রাখে। বলে, পাচ্ছিস।

হ্যাঁ বাবা।

কোথা থেকে আসে।

রানু তখন চুপচাপ শুয়ে থাকে। আর কিছু বলে না। এক টুকরো আপেল ক দানা আঙুর এবং নাসপাতি এনে দেয় মালতী। বলে, খা। খাতো মা। না খেলে বাঁচবি কী করে।

এই খাওয়া নিয়ে সংসারে এখন কত অশান্তি। মেয়েটা কিছুতেই কিছু খেতে চায় না। কেমন ভেতর থেকে তার দুর্গন্ধ উঠে আসে তখন। বাবার এত আয়াস, মার এমন যত্ন, তার কাছে তখন অত্যাচার মনে হয়। সে চিৎকার করে ওঠে কখনো তোমরা সবাই মিলে কেন আমাকে মেরে ফেলতে চাও। আমি কি করেছি।

মালতী আর পারে না। ডাক্তার মজুমদার বললেন, খাওয়াতেই হবে। অসুখটা কি ঠিক তো ধরা যাচ্ছে না। সবই তো করালেন। ট্রপিকেলে রেখে দেখলেন। কোথাও কেউ শরীরে কোনো ত্রুটি খুঁজে পাচ্ছে না।

এবং এভাবে দিন দিন মেয়েটা যখন শুকিয়ে যাচ্ছিল এবং সংসারে সত্যনারায়ণ যখন চতুর কথাবার্তা বলতে আর একদম সাহস পায় না, অথবা কোনো বিল পাশ করে দেবার ব্যাপারে একটা মোটা অঙ্কের টাকা হাতে এসে যায়, সে আর আগের মতো মালতীর হাতে দিয়ে ভরসা পায় না। কেবল মনে হয় কোথাও কোনো দুর্গন্ধ উঠছে, সে ভেতো মানুষ বলে, মালতীর চর্বি জমেছে বলে টের পাচ্ছে না। মেয়েটার ভেতর এখনো সে-সব দুর্গন্ধ জমা হয়নি, বাইরের সামান্য অন্ধকার চেহারা তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। সত্যনারায়ণ বলল, রানু তোমার কিছু হয়নি। ওটা তোমার ম্যানিয়া।

রানু ও-পাশ ফিরে শুয়ে আছে। পাখা ঘুরছে। কোথাও রেডিওতে বিবিধভারতী হচ্ছে, কোথাও কেউ পেট ভরে খেয়ে বড়ো ঢেকুর তুলছে এবং জানালা দিয়ে সেই অতীব গন্ধটা সারা বাড়ি ছেয়ে ফেলছে কেউ টের পাচ্ছে না। ওর হাই উঠছিল। জানালাটা বন্ধ করে দিলে ভালো হত। অথচ বন্ধ করে দিলেই কেমন দমবন্ধ ভাব। সে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। কপাল ঘামে। শরীরের শুচিতা কেমন নষ্ট হয়ে যায় তার। তখন চিৎকার করতে থাকে, মা আমাকে কোথাও নিয়ে চল। এ-ভাবে এখানে থাকলে মরে যাব। মালতী হতাশ গলায় তখন বলে, রানু তোমাকে নিয়ে পুজোর ছুটিতে গোপালপুর চলে যাব, আর কটা দিন, বাবার ছুটি হলেই আমরা চলে যাব। চলে গেলেই তুমি আর গন্ধটা পাবে না। তুমি নিরাময় হয়ে যাবে।

রানু আবার চুপ করে থাকে। কথা বলে না। এমন সুন্দর মেয়েটা, কি ভারী চোখ তার, আর হাত-পা লম্বা হয়ে যাচ্ছিল, চুল বড় হয়ে যাচ্ছিল। শরীরে সব অমোঘ নিয়তিরা বাড়ে দিনে দিনে। তখন কি না একটা অসুখ। কিছুই খাওয়ানো যায় না। যতটা খায় তার চেয়ে বেশি বমি করে দেয়। উগরে দেয় যেন। ভেতরে কোনো দৈত্য বাসা বেঁধেছে। সুখী মেয়েটাকে এমন দুঃখী করে রেখেছে এবং একদিন চোখের ওপর বুঝতে পারে মেয়েটা মরে যাবে।

সত্যনারায়ণ সেদিন দেবদারু গাছটার নীচে এসে থমকে দাঁড়াল। একটা মরা পায়রার ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। পায়রা না ডাহুক না কাক, সে আর এখন সঠিক কিছু বুঝতে পারছে না। বাতাসে সব পালক উড়িয়ে নিয়েছে। কেন একটা পচা দুর্গন্ধ এসে নাকে

লাগতেই ওপরে জানালায় দেখল রানু দাঁড়িয়ে দেখছে। আর তখনই কেন জানি ওর ইচ্ছে হচ্ছিল, লাথি মেরে এই বৌটির হাঁড়ি পাতিল, ছেড়া কাঁথা কাপড়, পলিথিনের বাক্স সব ফেলে দেয়। দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। কতদিন পর ওর চোখের ওপর এই সব বেআইনি ইতর মনুষ্যকুলের নোংরা তৈজসপত্র তাকে গিলে খাচ্ছিল। রানু কোনো দিন বলেনি, বাবা, ওখানে গন্ধটা আছে। তুমি ওদের দূর করে দাও।

আর সত্যনারায়ণের মাথায় কেমন রক্তপাত আরম্ভ হয়ে যায়। সে চিৎকার করে উঠল, রানু তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছ যাও ভিতরে যাও! অথচ সে দেখছে, পাঁচ-সাতটা অপোগণ্ড শিশু সেই ছেড়া পায়রার মাংস ভারি যত্নের সঙ্গে ভাঙা এনামেলের প্লেটে কেটে কেটে রাখছে। সাদা ফ্যাকাশে মাংসের টুকরো। পচা গন্ধটা অবিরাম সুখ দিচ্ছিল যেন। সামান্য লঙ্কাবাটা মাখিয়ে একটু আগুনের দরকার, কোথা থেকে প্লাইউডের একটা ভাঙা বাক্স টানতে টানতে নিয়ে আসছে। বুড়ো মানুষটা দা দিয়ে কোপাচ্ছে কাঠ, আর দু-তিনটে ইঁটের ওপর হাইড্রেনের জল তুলে সেদ্ধ করছে বৌটা, ওরা নোংরা শালপাতা এনে বাসি রুটি ভাগ করে বসে আছে। মাংসটা পোড়া সেদ্ধ। পচা গন্ধটা ওদের পেটে। খিদের উদ্রেক করছিল। জুল জুল চোখে তাকিয়ে আছে সব কটা জীব। সামান্য হলেই হামলে পড়বে। পোড়া চিমসে মাংস পোড়া গন্ধ। মেয়েটা তখন জানালায় নেই। অবিরাম গন্ধবাহী বাতাস দিকে দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রায় সে যেন কোনো শ্মশানে। মানুষের পোড়া মাংসের চামসে গন্ধের মতো উঠে এলে একদণ্ড সত্যনারায়ণ আর দাঁড়াতে পাড়ল না। সে সোজা সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে দরজা জানালা বন্ধ করে দেবার সময় দৌড়ে গেল বাথরুমে। তারপর অক করে বমি করে দিল সবটা।

মালতী দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছে। সহসা এই বমি সত্যনারায়ণের, সে কেমন স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। একটা কথা বলতে পারছে না। রানুর মতো একেবারে সোজা এমন একটা ঘটনা, ফের আর এক জনকে আক্রমণ করবে এ সংসারে সে কখনো ভাবেনি।

চোখে-মুখে জল দিয়ে সত্যনারায়ণ বের হয়ে এলে বলল, কী হয়েছে। তুমিও শেষ পর্যন্ত? সংসার কী যে হবে!

সত্যনারায়ণ বলল, গন্ধ!

কীসের গন্ধ?

বারে পাচ্ছ না!

না তো। ঠিক রাণু যে-ভাবে বমিটমি করে চোখে-মুখে জল দিয়ে দাঁড়াত, কথা বলত, এবং শূন্যতা ফুটে উঠত চোখে, সত্যনারায়ণ ঠিক ঠিক হুবহু একইভাবে কথা বলছে।

মালতী বলল, তোমরা আমাকে পাগল করে দেবে? কীসের গন্ধ—আমি তো পাচ্ছি না।

পাবে। বলে সে বসার ঘরে সোজা ঢুকে ডায়াল করল হ্যালো, সুকুমার আছে?

সুকুমার? আছে ধরুন।

সকুমার বলল, কি দাদা, আমি সুকুমার বলছি।

তোমার দাদাকে একটা খবর দিতে পার? যাতে একটা ব্যবস্থা হয়।

কেন কী হয়েছে?

আর বলো না, নীচে আমাদের দেবদারু গাছটার নীচে যা সব হচ্ছে না! দেশে কি মানুষ নেই! তোমার দাদা তো একজন কর্তাব্যক্তি।

কী হচ্ছে বলবেন তো।

পঙ্গপাল।

পঙ্গপাল কোথাকার।

জানি না। বাড়িতে টেকা যাচ্ছে না। আমরা সবাই এবার মরে যাব। হতাশ গলায় বলে যেতে থাকল সত্যনারায়ণ।

এইতো সেদিন কিনলেন। এত তাড়াতাড়ি হুজ্জতি আরম্ভ হয়ে গেল। বুঝিয়ে বলুন না ওদের। কোনো লাভ হবে না। তুমি একবার অবশ্যই আসবে। ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।

কী হয়েছে বলবেন তো।

না এলে বলা যাবে না।

সুকুমার এল সন্ধের একটু আগে। সারাক্ষণ সুকুমার আসবে ভেবে সত্যনারায়ণ জানালায় মুখ রেখে দাঁড়িয়েছিল। দেবদারু গাছটার নীচে এখন সেই বৌটা তার পঙ্গপাল নিয়ে বসে রয়েছে। একটা খনি বাজিয়ে বুড়ো লোকটা গান ধরেছে। ছোটো দুটো ছেলে বুড়োটার চারপাশে টুইস্ট নাচছে। রাস্তায় গাড়ি রিকশা তেমনি, নির্বিকার মানুষজন, এমন একটা পোড়া চামসে গন্ধ কারো নাকে লাগছে না। ওর তো সেই গন্ধটা সেই যে নাকে লেগে রয়েছে আর যাচ্ছে না। শনিবার বলে সকাল সকাল ছুটি। বেশ বড়োরকমের দাঁও মেরে উল্লসিত, একদণ্ড অপিসে সে দেরি করেনি। সোজা বাড়ি ফিরে মালতীর হাতে গোছা গোছা টাকা দিয়ে কোন একাউন্ট কীভাবে জমা দিতে হবে, এবং মালতীর জন্য আর দুটো নতুন ডিজাইনের অলংকার এ-ভাবে ভেবেছিল, হাতে মুখে চুমো খেয়ে রাতে

একটা থিয়েটার সেরে আসবে। রান্নার মেয়েটা বাড়ির পাহাড়ায়। রানু শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়বে। রানু আজকাল একটু একটু খেতে পারছিল। বেশ নিরাময়ের ছবি আবার যখন ফুটে উঠছিল চারপাশে, তখনই সে একটা পোড়া চামসে দুর্গন্ধে বমি করে দিল। সিঁড়ির গোড়ায় যারা থাকে, অর্থাৎ একতলার ফ্ল্যাটে ওরা গন্ধটা পাচ্ছে না। পেলেও বোধ হয় আসছে যাচ্ছে না খুব একটা। সে সবাইকে জিজ্ঞেস করছিল গন্ধটা আপনারা পাচ্ছেন না! ওরা কেমন নির্বিকার মুখে তাকিয়ে দেখছিল, সত্যনারায়ণকে। লোকটা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মেয়েটা তার কতদিন থেকে একটা গন্ধ পাচ্ছিল, এবার সে পেতে শুরু করেছে।

সে বলেছিল পাবেন, আপনারাও পাবেন। বাড়ির সামনে এই সব বেওয়ারিশ মাল অখাদ্য–কুখাদ্য এনে জড়ো করছে, না পেয়ে যাবেন কোথায়!

এবং বৌটার খোলা বুকে একটা নতুন বাচ্চা, এই মনে হয় দু-চার দিনও হয়নি, একেবারে বুকের ভেতর মুখ লাগিয়ে রেখেছে। হাত-পা কাঠি কাঠি সবুজ শরীরটা, আজ কি কাল, যেমন রানু হবার সময় সে হাসপাতালে গিয়ে একদিনের বাচ্চা রানুকে দেখেছিল, চামড়া কোঁচকানো, এবং চোখ মেলে তাকাতে পারছে না। আর তখনই জানালার নীচে সুকুমার, সে প্রায় স্বর্গ পাবার মতো চিৎকার করে বলল, এলে সুকুমার! পাশে দেখেছ?

সুকুমার চারপাশে তাকাল। সে এমন কিছু দেখতে পেল না। কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই, কেউ বাস চাপাও পড়েনি, কোনো মৃতদেহ বাড়ির পাশে কেউ ফেলে রেখে যায়নি, বরং বুড়োটা তার দুই নাতি নিয়ে, দুজন যুবক ছোঁড়া, এবং কিছু বেশি বয়সের দু-তিনটে মানুষ গোল হয়ে কলকাতার আকাশ পরিষ্কার দেখে খ'নি বাজিয়ে গান ধরেছে। পাশে পোস্টাফিসে আলো জ্বালা হয়ে গেছে। আকাশের মাথায় ভাঙা চাঁদ। দেবদারু গাছটা ভারি সজীব। সুন্দর মতো এক যুবতী স্বামীর সঙ্গে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে আছে। পান খেয়ে রাঙা ঠোঁট উলটে পালটে দেখছে। কোথাও কিছু সে অস্বাভাবিক দেখতে পেল না। সত্যদার মেয়েটার ক-মাস থেকে কী একটা অসুখ কখনো ভালো হয়ে যায়, কখনো বিছানা থেকে একেবারে উঠতেই পারে না—এসব খবর সে পেয়েছে। দু-চারবার সে দেখেও গেছে। কী একটা গন্ধ পায় সংসারে। মেয়েটা আসলে ভারি আদরে মানুষ, ন্যাকা। একটুতেই ঘাবড়ে যায়। এমন একটা বয়সে বালিকারা ভারি কৌতূহলী হয়ে যায়। সংগোপনে সব কিছু দেখে বেড়াবার স্বভাব। আর কিনা মেয়েটা রুগ্ন বালিকার মতো জানালায় দাঁড়িয়ে থাকছে! ভেতরে আসলে সেই অসুখ হয়তো, বড়ো হতে গেলে কিছু অসুখ শরীরে আসবেই—সে এই সব ভেবে সিঁড়ি ভেঙে যত উঠছিল তত মনে হচ্ছিল, সত্যনারায়ণদা, ভারি মুসিববতে পড়ে গেছে।

সুকুমার বলল, কিছু তো দেখলাম না!

কিছু না?

না তো!

তোমাদের চোখ নেই! তোমরা এত ভোঁতা মেরে গেছ।

সুকুমার অবাক। চোখ-মুখ ভয়ংকর রকমের ভীতু, ভূতটুত দেখলে এমন চোখ মুখ হবার কথা। সুকুমার মনে মনে বলল, তোমার মাথাটা গেছে। চুরি করে ফাঁক করে দিচ্ছ—ধরা পড়ে যাবে ভয়ে শালা তুমি এমন মুখ করে রেখেছ। পাগলামী করলেও রেহাই নেই। এবারে চাঁদ সত্য কথাটা বলে ফেল।

সুকুমার বলল, রানু কেমন আছে দাদা? দুদিন বেশ খাচ্ছিল, আজ আবার খেতে পারছে না গন্ধ।

অনেক তো করলেন!

হঠাৎ কেমন অসহায় মানুষের মতো চেপে ধরল সুকুমারের হাত। বলল, তুমি বাঁচাও। তুমিই পার।

সুকুমার বলল, আপনি বসুন তো। উতলা হবেন না। বৌদি বৌদি! সে দরাজ গলায় ডাকলে, মালতী এসে দাঁড়াল সামনে। ওরও চোখ-মুখ কেমন শুকনো। সেই নির্মল হাসিটুকু নেই।

আপনাদের কী হয়েছে?

জানি না ভাই। আর ভালো লাগছে না। সত্যনারায়ণ বলল, থানায় তোমার দাদাকে একটা খবর দিতে হবে।

কেন? দেবদারু গাছটা সাফ করা দরকার।

গাছে কী হয়েছে?

গাছের নীচে সব পঙ্গপাল। অখাদ্য কুখাদ্য খায়।

খাচ্ছে খাক না। আপনার কী তাতে?

নীচে যা তা সেদ্ধ করে খাবে, আর ওপরে আমরা থাকব। সে কখনো হয়? গন্ধ! বলেই যেন ছুটে বের হয়ে গেল সত্যনারায়ণ!

মালতী বলল, বুঝলেন!

হুঁ বুঝছি। দেখি। এদের সরানো যায় কী না।

সত্যনারায়ণ ফিরে এসে বলল, যা হয় করো একটা ভাই। আমরা না হলে মরে যাব। দুদিন বাদে ঠিক মালতীও বমি করে দেবে। তখন আমরা তিনজন, আমি বলছি, কেউ বাদ যাবে না, পাশের ফ্ল্যাট, নীচে সবাই। আস্তে আস্তে সবাই পাবে। সবাই মরবে। একটা কিছু করো।

সুকুমার প্রথমে ওর দাদার কাছে গেল। ওর দাদা বলল, আইনে নেই। তাড়াবার কোনো আইন নেই। শেষে স্মরণ নিতে হল ছেলেদের।

ওরা বলল, সরে পড়।

কোথায় যাব বাবু!

আমরা কী জানি কোথায় যাবে!

বুড়ো লোকটা বলল, চলে যাব বাবু। সকালে চলে যাব।

এক্ষুনি। তোমাদের জন্য ভদ্রলোকেরা আর শহরে থাকতে পারবে না। সব অকর্ম-কুকর্ম করে বেড়াচ্ছ, আমরা বুঝি জানি না!

ছেলেগুলো সব পোঁটলাপুঁটলি মাথায় নিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে। হাঁড়ি-পাতিল বুড়ো মানুষটা। চুল সাদা, কানি পরণে, নাকের ভেতরে বড়ো গর্ত, কান বড়ো এবং লোমে ভরতি। বুড়ো মানুষটা, দু-বছরের বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলে আরও দু-চারজন এসে ঘিরে দাঁড়াল। এবং যা হয়ে থাকে বেশ সোরগোল পড়ে গেল। আর তখন যায় কোথায়। দৌড়ে পালাতে পারলে বাঁচে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওরা দৌড়ে কোথায় চলে যাচ্ছে। নিমেষে দেবদারু গাছটার চারপাশ কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। কিছু ভাঙা হাঁড়ি-পাতিল, পোড়া ইঁট, দুর্গন্ধময় কিছু ছেড়া কানি, আর সব পচা জীবজন্তুর উচ্ছিষ্ট হাড় মাংস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। সত্যনারায়ণ জমাদার ডেকে জায়গাটা সাফ করে ফেলল, গঙ্গাজলে ধুয়ে দিল। শরীরে এবং চারপাশে যা-কিছু আছে তার ওপর ওডিকোলন ছড়িয়ে এবং রাম রাম বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল। তারপর দরজা-জানালা খুলে দিল সব। রানুকে নিয়ে জানালায় একবার দাঁড় করিয়ে বলল, পাচ্ছিস?

রানু নাক টেনে বলল, না বাবা। এখানে?

না বাবা।

এদিকে আয়। দ্যাখ তো...?

না বাবা।

তারপর সত্যনারায়ণ ভালো করে ঘর বারান্দা ধুয়ে দিতে বলল, রান্নার মেয়েটিকে। যেখানে যা-কিছু আছে সব তাতেই গন্ধটা লেগে আছে ভেবে জল দিয়ে একেবারে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলল। মাছ-মাংস রান্না হল না। নিরামিশ আহার করল সত্যনারায়ণ। সত্যনারায়ণ এবং রানু আজ কত দিন পর যেন পেট ভরে ভাত খেল।

আর আশ্চর্য সে রাতে শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ল। এবং নাক ডাকতে থাকল। কিছুক্ষণ পর নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেল। কেউ যেন তাকে ডাকছে। অমা দেখ এসে কী ব্যাপার। সে উঠে গেল জানালায়! আবার নতুন কারা আসছে। এবার একজন দুজন নয়। সে দেখল, গাছটার নীচে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। চারপাশ থেকে পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসছে। মাথায় হাঁড়ি পাতিলা, বৌ একটা নয়, একেবারে সার দিয়ে এবং সবার কোলে বাচ্চা। পাঁচটা সাতটা করে অপোগণ্ড, উলঙ্গ প্রায় তারা সব, চুল সনের মতো, এবং অভাবী মানুষ। ওদের সঙ্গে আছে সব পচা শাকসবজি, উচ্ছিষ্ট খাবার। পচা পরিত্যক্ত মাছ-মাংসের হাড়। মাছি ভন ভন করছে। কত দিন চান করে না এরা, যেন এরা ক্রমে শহরের সব কিছু অধিকার করে নিতে আসছে। এবং সে দেখতে পেল, অফিস-কাছারি করতে পারছে না মানুষ, রাস্তা পার হতে পারছে না। ডিঙিয়ে যেতে হচ্ছে। পায়ে হাতে সেই গন্ধ নাকে এসে লাগছে। মানুষেরা চারপাশে যারা আছে অক অক বমি করছে। চোখের ওপর একটা বেড়াল ছানা আগুনে লোহার শিকে সেঁকে নিচ্ছে। আদিম বন্য হিংস্র এক জাতি এসে এমন সুসময়ে কলকাতার সব জুড়ে বসতে চাইছে। রানু, মালতী সে পাশের ফ্ল্যাটে, নীচের ফ্ল্যাটে এবং সর্বত্র সেই অক অক জল বমি। প্রায় মহামারীর মতো সব শহরকে গ্রাস করছে। এক প্রাগৈতিহাসিক জীবের মতো

ওদের সার সে রানু মালতীর হাত ধরে শহর লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। প্রায় আধমরা হয়ে আসছে। চোখ-মুখ ছিটকে বের হয়ে যাবার মতো। যেন এবার তারা কোণঠাসা করে মারবে তাকে। সব কলকাতা এ-ভাবে পঙ্গপালে ছেয়ে গেল। সে চিৎকার করে উঠল, সুকুমার বাঁচাও।

ওর ঘুম ভেঙে গেল। সে গলা শুকনো বোধ করল। জানালা খোলা। ভয়ে জানালায় পাশে যেতে সাহস হচ্ছে না। জিরো পাওয়ারের আলো জ্বলছে। মালতী অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ও-ঘরে রানু। সে পা টিপে টিপে এগোতে থাকল। ওরা এখনো ঘুমোচ্ছে। তার চিৎকার পর্যন্ত শুনতে পায়নি। শহরের ফুটপাতে এত মানুষ যাচ্ছে টের পাচ্ছে না। সে কোনো রকমে পা টিপে টিপে জানালার গিয়ে দাঁড়াল। আশ্বিনের বাতাস। দূরে ঢাকের বাদ্যি বাজছে। আর চাঁদের মরা আলোতে সে দেখতে পেল ভূতুড়ে দেবদারু গাছটা একাকী। নীচে একটা রাস্তার কুকুর শুয়ে আছে। গাছটার নীচে কেউ চলে আসেনি। কলকাতা আবার নিরিবিলি নিজের ভেতর ডুবে আছে। কলকাতা আছে কলকাতাতেই।